

অভিসন্দর্ভের বিষয়

“স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন – সমাজ – সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)”
“Swadhinata- Uttar Bangla Upanyase Adibasi Jiban – Samaj – Sanskriti (1947-2000)”

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত পিএইচ. ডি ডিগ্রির গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বৈশাখী কুণ্ডু

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা নির্দেশক

ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

২০২১

উপসংহার

বর্তমান “স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন – সমাজ - সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)” শিরোনামের গবেষণা-সন্দর্ভের আলোচনায় মূলত দু’টি বিষয় সমান্তরালভাবে এসেছে- একটা ভারতের আদিবাসীদের পরিচয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মিথ-বিশ্বাস-প্রথা-ট্যাবু প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অবস্থান ও তার ওপর নেমে আসা নানা অভিঘাত, ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা তাদের বিদ্রোহ, আন্দোলন এবং তাদের প্রতি অনাদিবাসী উচ্চবর্গের মানসিকতার পরিচয়; অন্য অংশে বাংলা উপন্যাসের একটা বিস্তৃত সময়পর্বে আদিবাসী জীবনের এই দিকগুলির বাস্তবনিষ্ঠ নির্মাণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। স্বাধীনতা-উত্তর প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাস এই প্রান্তিক ও দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত মানুষদের গোষ্ঠীজীবনকে, শুধুমাত্র তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, পালা-পার্বণকেই তুলে ধরেনি, তুলে ধরেছে তাদের প্রতি ঘটা দীর্ঘদিনের আর্থিক শোষণ, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বাধ্য-বাধকতা, তাদের প্রতি হওয়া ঘৃণার নির্যাতন ও তাদের প্রতিবাদকেও। এই সমস্তটা মিলিয়েই তাদের জীবনকে জানা-বোঝার পরিসরের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। অতীতের সাহিত্য উপাদানে এই আদিবাসীদের পরিচয় বা নাম যাই থাকুক না কেন ভারতে ইংরেজ শাসনকালেই আদিবাসী চিহ্নিতকরণের ও স্বরূপ সন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ছাড়াও সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আদিবাসীদের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতের আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ বা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নিরিখে চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণকে সামনে রেখে ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, তাই

বিভিন্ন সময়ে এই তালিকা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। বর্তমানে (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ভারতে ৭০৫টি জনগোষ্ঠী আদিবাসী / উপজাতি বলে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত।

দেশের বেশিরভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ইংরেজ শাসনকালেই তাদের আর্থ-সামাজিক মোটামুটি স্থিতাবস্থা বা স্বনির্ভরশীলতা নষ্ট হয়। গবেষণার আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে ব্রিটিশ সরকারের আইনের ফলেই আদিবাসীদের সঙ্গে জঙ্গলের সম্পর্ক আমূল বদলে গেছিল। ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন আইন ও পদক্ষেপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনজাতির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল, যেমন- “ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট”- এর মতো কদর্য আইনের জেরে সেই আইন উঠে যাওয়ার এতগুলো বছর পরেও লোখাদের মতো আদিবাসীরা সামাজিক ঘৃণা ও অপবাদের সঙ্গে এখনও লড়ে যাচ্ছে। বাংলা উপন্যাসে এই ঘৃণার প্রবহমানতা ও তার বিরুদ্ধে লড়াইটা বাস্তবসম্মতভাবেই উঠে এসেছে। উপন্যাসিকের কলম একই নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিক গোত্রের মধ্যকার জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভেদ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে দেখিয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যকার গোষ্ঠীলড়াইও বাস্তব সত্য। উপন্যাসের আলোচনায় যেমন একদিকে নাগাপাহাড়ের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যকার বংশানুক্রমিক শত্রুতা উঠে এসেছে, তেমনি পেয়েছি সাঁওতাল ও লোখাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকেও। বিশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই বিশ্বজুড়ে নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত শ্রেণিচেতনা বাংলাসাহিত্যে ও উপন্যাসে প্রান্তিক গোষ্ঠীজীবন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। কিন্তু তার পূর্বের বাংলা সাহিত্যেও এই সকল জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ও অংশত অস্তিত্ব ছিল। উপন্যাসদেহের সমগ্র অংশ জুড়ে আদিবাসী প্রান্তিক জীবনকে দেখানোর পূর্বের প্রস্তুতি ও আয়োজন দেখেছি স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত বেশ কিছু উপন্যাসে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের পক্ষে আদিবাসীদের

উন্নয়ন ও স্বতন্ত্রতা রক্ষার সঠিক সমন্বয়ই ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে তাদের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র সংবিধানে কিছু হিতকর পদক্ষেপের কথা বলেছে। কিন্তু বাস্তবের অনুসরণে উপন্যাসেও পাই রাষ্ট্র কর্তৃক কল্যাণমুখী পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণের অভাবের সত্যতাকে। দেখেছি আদিবাসী সমাজ নিজ স্বতন্ত্রতা হারিয়ে মূলধারায় মিশে যাওয়ার বাধকতা নিয়ে সবচেয়ে কঠিন সংকটের মুখে। এইভাবে বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বাহক নানা জনগোষ্ঠীর জীবন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে বার বার উঠে আসে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা নিয়ে, তাদের সংকট ও প্রতিরোধ নিয়ে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির চর্চায় মগ্ন থাকা পাঠককে এইধরনের উপন্যাস দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির খোঁজ দেয়। নাগরিক আগ্রাসনে তাদের অস্তিত্বের সংকট সম্পর্কে সচেতন করে। আদিবাসী চেহারা, খাদ্যাভ্যাস, মেধা প্রভৃতির যে ন্যারেটিভ অনাদিবাসী সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে- ঘৃণা ও অবমাননার সেই ন্যারেটিভ ঔপন্যাসিকের কলমে স্পষ্টতই ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে আমরা পেয়েছি এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মানসিক লড়াইকে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যে সকল রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, মিথ ও প্রথা তাদের জীবনকে, নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসাকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে, দেশজ সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও জানার প্রক্রিয়ায় প্রান্তিকজীবনের এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস উঠে আসে গোষ্ঠীজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসগুলিতে। নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে উপন্যাসগুলির নিবিড় পাঠে উঠে আসে অনেক অজানা কথা, অনালোকিত অধ্যায়। একইসঙ্গে সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা, দেবতা-অপদেবতার ভীতি, ডাইনি প্রথার ভয়াবহতা, ডাইনি নির্মাণের ষড়যন্ত্রকে মানব-মানবীর জীবন ও হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অনন্য ভঙ্গিতে ঔপন্যাসিক তুলে আনেন তাদের জীবনের কঠিনতম বাস্তবকে।

এই সূত্রেই আসে গোষ্ঠীজীবনের ভাঙনের প্রসঙ্গ। দেখা যায় আদিবাসী কৌমজীবনে ভাঙনের পেছনে নিহিত থাকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর নিরন্তর আঘাত এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। ব্রিটিশ সময়কাল থেকে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়পর্ব পর্যন্ত বারবার তাদের আর্থিকজীবনের ওপর আঘাত এসেছে। তাদের অরণ্যনির্ভর জীবন, গ্রামজীবন ভেঙে পড়েছে। আমরা এই আর্থ-সামাজিক অভিঘাতগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি একটা সত্যতা আসলে আরেকটা সত্যতাকে ধ্বংস করার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। কৃষিসভ্যতা গ্রাস করেছে অরণ্যকে, কৃষিজমির তাগিদে ক্রমেই ছোটো হয়ে গেছে অরণ্য। আবার খনির আবিষ্কার, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পায়ন, নগরায়ণের টেউ নষ্ট করেছে কৃষিজমিকে। ফলে অরণ্যনির্ভর, কৃষিনির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সংকট তৈরি হয়েছে বারবার। আড়কাঠির হাত ধরে কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী মানুষগুলো কখনও চা-বাগানের, কখনও রেললাইনের, কখনও সড়ক নির্মাণের মজুর হয়ে গেছে। তারপরে চা-বাগান বন্ধ হলে আবারও আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তারা। আর্থ-সামাজিক যে অনিবার্যতায় বহুযুগ আগে তাদের কেউ কেউ হিন্দুসমাজদেহে শূদ্র হয়ে গেছিল, তেমনই কেউ কেউ ব্রিটিশযুগে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তাদের জীবনের বারবার ঘনিয়ে আসা এই আর্থ-সামাজিক সংকটের সত্যতাও খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে কোনও কোনও উপন্যাসে। ব্রিটিশ সময়কাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আদিবাসী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকারের লেখনীকেও পরিপুষ্ট করেছে। ইতিহাসের আলোয় উপন্যাসের ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি আদিবাসী আন্দোলন বা বিভিন্ন আন্দোলনে আদিবাসী অংশগ্রহণের কারণের সঙ্গে আসলে যুক্ত শোষণ ও বঞ্চনার ধারণাই, সে পরাধীন ভারতে হোক বা স্বাধীন ভারতে। আবার এই শোষণ ও বঞ্চনার উৎসের সূত্র ধরে খুঁজে পেয়েছি উচ্চবর্গীয় ঘৃণার বহুস্তরকে। উপন্যাসিকের কলম দেখিয়েছে এই

অবহেলা ও ঘৃণায় কেমনভাবে জড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রও। এই গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে পেয়েছি নিম্নবর্ণীয় এই আদিবাসীদের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, উদাসীনতা ছাড়া করুণা বা সহানুভূতি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সমানুভূতি তৈরি হয় না। সহনাগরিক ও সমমর্যাদার ভাবনায় পৌঁছতে বাকি থেকে যায় অনেকটা পথ।

পঞ্চাশ বছরের একটু বেশি সময়পর্বের বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনের রূপায়ণকে, নির্মাণকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জীবন, সমাজ, সংস্কৃতির স্বরূপ ও সমগ্রতাকে ধরার প্রয়াস এই গবেষণায় থাকলেও হয়তো বাকি থেকে গেল অনেককিছুই। অন্য কোনো গবেষকের অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজে নেবে এইকেন্দ্রিক উপন্যাসে উঠে আসা কোনও অনালোচিত অংশকে, দিককে। শুধু তাই নয়, বহমান এই ধারায় ক্রমেই সংযোজিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি আদিবাসী জীবনকেও প্রভাবিত করছে। ফলে, উপন্যাসিকের কলমে প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে আরও নানা দিক। আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনের উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ উপন্যাসিকদের কলম যে বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে নিয়ে আসছে, তাতে সম্ভাবনাময় এই ধারা নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ থাকছেই। আমাদের এই গবেষণা-সন্দর্ভ ভবিষ্যতের সেই গবেষণায় সহায়তা করতে পারবে বলে আশা রাখি।